# ধর্মীয় দাবী সম্পর্কে যে কারনে আমি একজন সংশয়বাদী

মূল রচনাঃ পল কার্জ*

অনুবাদঃ জাহেদ আহমদ এবং অভিজিৎ রায়

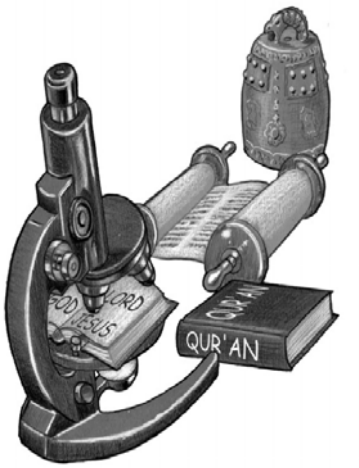


ধর্মে অবিশ্বাসীরা সাম্প্রতিক সময়ে তাঁদের আদর্শ গত অবস্থান তুলে ধরার প্রকৃত পন্থা নিয়ে বিতর্ক করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞানী এবং দার্শ নিক (যেমনঃ রিচার্ড ডকিনস, ডেনিয়েল ডেনেট প্রমুখেরা) সাম্প্রতিক কালে *'ব্রাইট'* শব্দটি ব্যবহারের প্রতি সহানুভূতিশীলতা দেখিয়েছেন। তাঁরা ভেবেছেন, এটি একটি বুদ্ধিদীপ্ত ধারণা এই অর্থে যে- *'ব্রাইট'* শব্দটি এই ক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দাবলীর (যেমন- নাস্তিকতা) সাথে সংশ্লিষ্ট অতীতের অনেক নেতিবাচক প্রচার ও ধারণার অবসান ঘটাতে সহায়ক হবে। অনেকে এটাকে দার্শনিক অবস্থানগত দিক থেকে এক আকর্ষনীয় উত্তোরণ হিসবে দেখেছেন। পক্ষান্তরে, এই ধারণার বিরোধীদের বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের এটা মনে করা অসমীচিন যে আমরা নিজেরা *ব্রাইট* বা বুদ্ধিমান আর আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সবাই বুদ্ধিহীন বা মেধাশূণ্য। সন্দেহ নেই, 'নাস্তিকতা' বিশেষ্যটি অনেকের মনে নিরুৎসাহের জন্ম দেয়, তাঁরা এটাকে একটা অতি নেতিবাচক বা কট্টর মতবাদ বলে মনে করেন। অন্যরা এ ক্ষেত্রে 'অজ্ঞেয়বাদ'-এর আশ্রয়কে সুবিধাজনক মনে করেন; তাঁরা বলেন, ঈশ্বর প্রশ্নে তাঁদের অবস্থান সম্পূর্ণ অনিশ্চিত—যা কোন কোন সময় বিশ্বাসকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ও একটি কৌশলজনক পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়।

*ধর্মে অবিশ্বাস* বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আমি এখানে আরেকটি শব্দ উপস্থাপন করতে চাই যা আমার চোখে অধিকতর বেশি সংগতিপূর্ণ। কেউ শুধু এ ভাবে বলতে পারেন যে *'আমি একজন সংশয়বাদী'।* দর্শনের জগতে এটি একটি ক্লাসিক্যাল ধারা, তথাপি আমি জোর

দিয়ে বলব, এটি আজ ও প্রাসংগিক কেননা ধর্মীয় দাবি সমূহ সম্পর্কে আজ অবধি অনেক মানুষই সংশয়ী।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশয়বাদের প্রচুর প্রচলন রয়েছে। সংশয়বাদীরা কোন একটা তত্ত্ব বা অনুকল্পকে সন্দেহের চোখে দেখেন যতক্ষন না পর্যন্ত সেটি পর্যাপ্ত প্রমাণ দ্বারা যাচাই করার মত পর্যায়ে পড়ছে। ধর্ম বিষয়ক সংশয়বাদীর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। ধর্ম কেন্দ্রিক সংশয়বাদীরা গোঁড়া নন, ধর্মীয় দাবিসমূহকে তাঁরা অগ্রিম বা পূর্ব্ব থেকেই প্রত্যাখান করেন না; কেবলমাত্র পর্যাপ্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে ঈশ্বরের ব্যাপারটি গ্রহণ করতে তাঁরা অপারগ। এক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে পর্যাপ্ত যুক্তি-প্রমাণ বা burden of proof সরবরাহ ও উপস্থাপণ করার দায়িত্ব কিন্তু বিশ্বাসীর উপরেই বর্তায়। কেবলমাত্র *বিশ্বাসের খাতিরে বিশ্বাস* বা *প্রত্যেকের রয়েছে বিশ্বাসের অধিকার* — প্রভৃতি দাবী এ ক্ষেত্রে প্রমাণ ও যুক্তির ক্ষেত্রে একেবারেই অগ্রহনযোগ্য ও বেমানান, কেননা তাহলে প্রত্যেকের খেয়ালখুশী মত বিশ্বাসকে ও আমাদের গণ্য করতে হবে। সে জন্যই একজন সংশয়বাদী কোন একটি অনুকল্প বা বিশ্বাস কে গ্রহণ করার আগে সেটির স্বপক্ষে প্রমাণ এবং যুক্তির অবতারনা চান। সংশয়বাদী অনুসন্ধানীরা (skeptical inquirer) সর্বদাই নতুন যুক্তি ও তত্ত্বের আলোকে তাঁদের বিশ্বাস পরিবর্তন করতে প্রস্তুত থাকেন। কোন প্রকার কর্তৃত্ব, প্রথা, ঐতিহ্য, অতীন্দ্রিয়বাদ, অলৌকিকত্ব বা ঐশী বাণীর দাবীকে তাঁরা গ্রহণ করেন না। হাতের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ অনুপস্থিত- এমন সব প্রশ্নের মীমাংশায় সংশয়বাদী অনুসন্ধানীরা তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখার পক্ষপাতী। সংশয়বাদীরা এই ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) কেননা, তাঁদের কাছে প্রশ্নটি এখনো পুরোপুরি অমীমাংশিত এবং বিতর্কের জন্য সদা উন্মুক্ত। এখানে তাঁরা অবিশ্বাসী এই অর্থে, প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধানকল্পে বিশ্বাসীরা যে সব ব্যাখ্যা হাজির করেন সেগুলিকে তাঁরা অপর্যাপ্ত প্রমাণ ও অগ্রহনযোগ্য তত্ত্ব হিসেবে দেখে থাকেন। সেজন্যই যে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তাঁরা অতিমাত্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার বলে মনে করেন। একজন সংশয়বাদীকে এই অর্থে অবিশ্বাসী বা নাস্তিক বলা যেতে পারে। আমার ধারণা, বিষয়টিকে আর ও প্রাসংগিক করে তুলে ধরা যায় এই বক্তব্যের মাধ্যমেঃ *এহেন* ব্যক্তি ধর্মীয় দাবী সম্পর্কে একজন *সংশয়বাদী।* দর্শন ও বিজ্ঞানের একটি সুসংহত ধারা হিসেবে সংশয়বাদ সর্বদাই ধর্মীয় অনুসন্ধানের জন্য দরজা দিয়েছে এবং সেখানে ঈশ্বর বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তি খুবই নগণ্য হিসেবে ধরা দিয়েছে। পাইরো, ক্রেটিলাস, সেক্সটাস এম্পিরিটাস এবং কার্নিয়াডিস প্রমুখ প্রাচীন দার্শ নিকেরা মেটাফিজিক্যাল এবং ধর্মীয় দাবী সমূহকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। দেকার্ত, বেকন, ল্যকে, বার্ক লে, হ্যুমে এবং কান্ট প্রমুখ আধুনিক দার্শ নিকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভংগি গড়ে ওঠার পেছনে ক্লাসিক্যাল সংশয়বাদের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। তাঁদের অনেকের কাছে 'ঈশ্বর বিতর্ক' ছিল একটা হেঁয়ালি বিষয়; অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াদির প্রত্যাখানের মধ্য দিয়েই হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা যেমনটি আমরা দেখি গ্যালিলিও, অন্যান্য বিজ্ঞানী এবং

পরবর্তীকালের মনীষী যেমন- ফ্রয়েড ও মার্ক্স, রাসেল ও দ্যুয়ে, সাঁর্ত্রে ও হ্যাগার, পোপার ও হুক, ক্রিক ও ওয়াটসন এবং ব্যঞ্জ ও উইলসন-প্রমুখদের ক্ষেত্রে।

*'ধর্মীয় দাবী সম্পর্কে আমি একজন সংশয়বাদী'- এ* অবস্থানটি *'আমি একজন নাস্তিক'* অবস্থানের চাইতে বেশি প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি কেননা প্রথম বক্তব্যটি অনুসন্ধানের গুরুত্ব তুলে ধরে। অনুসন্ধানের ধারণাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক উপাদান রয়েছে যেহেতু অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়, মহাবিশ্বে আমাদের আমাদের অবস্থান ও নিয়ত বর্ধনশীল মানব জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের উত্তরোত্তর সচেতন করে তোলে। যে সব কারণ ও প্রমাণ হেতু অনেক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ধর্ম বিশ্বাসীদের দাবীকে সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখেন, সেগুলির কয়েকটি আমি নীচে তুলে ধরব চেষ্টা করব। প্রাথমিকভাবে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব অতিপ্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব- বিশেষভাবে এক ঈশ্বর কেন্দ্রিক ধর্ম সমূহের নির্দেশনা মূলক নীতিজ্ঞান তত্ত্ব, আত্মার অমরত্ব এবং স্বর্গ-নরক ধারণাবলির মধ্যে। সীমিত পরিসরের কথা মাথায় রেখে ঈশ্বরের ধারণাকে খন্ডন করে যে আলোচনা আমি করেছি তা বিশাল ব্যাপ্তির সামান্য একটি খন্ডাংশ মাত্র।

শুরুতেই মনে রাখা দরকার সংশয়বাদী অনুসন্ধানীরা নীচের বিষয়গুলিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। যথাক্রমে-

একঃ ঈশ্বর বিরাজমান;
দুইঃ ঈশ্বর একজন ব্যক্তি সত্ত্বা;
তিনঃ আমাদের চূড়ান্ত নীতিজ্ঞানের উৎস হচ্ছেন ঈশ্বর;
চারঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস অসীম মুক্তির সন্ধান দিবে; এবং
পাঁচঃ ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতিত একজন মানুষের পক্ষে ভাল হওয়া সম্ভব নয়।

পাঠক-পাঠিকাদের আবার ও স্মরণ করিয়ে দেই, প্রমাণের দায়িত্ব (burden of proof) কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবী উত্থাপনকারীর ওপরই বর্তায়। ঈশ্বর বিশ্বাসের স্বপক্ষে তাঁরা যদি পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপন করতে অপারগ হন, তাহলে আমার অবশ্যই অধিকার আছে একজন সংশয়বাদী হিসেবে অবস্থান নেয়ার।

## কী কারণে সংশয়বাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সন্দেহের চোখে দেখেন?

প্রথমত, সংশয়বাদী অনুসন্ধানীরা ঈশ্বরের প্রচলিত বৈশিষ্ট্যসমূহকে (যেমন- 'অতিপ্রাকৃতিক,' 'সর্বশক্তিমান,' 'পরম করুণাময়', 'সর্বত্র বিরাজমান') সুসংহত, যৌক্তিকভাবে বোধগম্য কিংবা অর্থবোধক বলে মনে করেন না। মানুষের বোধশক্তির বাইরের (যেমনটি ধর্মবিদেরা দাবী করে থাকেন) কোন অতি প্রাকৃত সত্ত্বার অস্তিত্বের দাবী দ্বারা আমাদের চিরচেনা পৃথিবী ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আমরা কি ভাবে একটি অসংজ্ঞায়িত সত্ত্বার অস্তিত্বের দাবী করতে করতে পারি যদি আমরা না জানি- ঠিক কোন অর্থে সেই সত্ত্বার অস্তিত্বের কথা বলা হচ্ছে? কি ভাবে এমন একজন ঈশ্বর আমাদের বোধগম্য হবেন যিনি সময় ও মহাশূণ্যের বাইরে এবং যাঁর চরম মর্মার্থ বোঝা আমাদের সাধ্যের অতীত? ধার্মিকেরা একজন অজানা-অচেনা এক্স (X)-এর অস্তিত্বের দাবী জানাচ্ছেন। যদি তার সারমর্ম বোধশক্তির বাইরে হয়, তাহলে সেটি শূণ্য, কাল্পনিক বিমূর্ত ধারণার চাইতে ও বেশি কিছু। সে জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সংশয়বাদীরা শব্দার্থ বিদ্যার দৃষ্টিকোন থেকে ঈশ্বর বর্ণনাকে আপত্তিজনক মনে করেন কারণ- এটি বোধগম্যহীন এবং এতে স্পষ্ট কোন বিষয়বস্তু অনুপস্থিত। প্রায় সময় ঈশ্বরের পক্ষে দাবী উত্থাপন কারীরা এই যুক্তি দেখান যে ঈশ্বর হচ্ছেন সব কিছুর আদি উৎস, সে ক্ষেত্রে আমরা সহজেই দাবী উত্থাপন কারীর কাছে জানতে চাইব, 'ঈশ্বর নামক সত্তাটির উৎস তাহলে কি?' *ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ* কিংবা ঈশ্বরের পিছনে কোন কারণ নেই- এমন বক্তব্য আমাদেরকে অজ্ঞতার আর ও এক ধাপ পিছনে নিয়ে যায়। ভৌত মহাবিশ্বের বাইরে বিচরণ করার মানে হচ্ছে বিশ্বাসের পাখায় ভর করে যে কোন একটি উত্তর ধরে নেয়া। একই বিচারে, মহাবিশ্বের কারিগরিত্বের পেছনে রয়েছে বিশেষ ইন্টালিজেন্ট ডিজাইন (I.D.) -এমন দাবী ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয় যা সচেতন মানুষের পৃথিবীতে আমরা অবলোকন করি ঃ দ্বন্দ্ব, বাঁচার সংগ্রাম, ট্র্যাজেডি এবং দুঃখ-কষ্ট-বেদনা। নিয়মানুবর্তীতা এবং বিশৃংখলা মানেই ডিজাইন বা কারিগরিত্বের উপস্থিতি নয়। ডিজাইন বিষয়ক বিতর্ক আমাদের এরিস্টটলের নিয়তিবাদ -এর সেই বক্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে উদ্দেশ্য বা সমাপ্তি। কিন্তু প্রকৃতিতে সে রকম উদ্দেশ্যের কোন প্রমাণ আমরা পাই না। আর মহাবিশ্বে কখনো কোন পরিকল্পনা বা ডিজাইনের ছাপ আছে মনে হলেও (মনে হওয়া মানেই ডিজাইনড নয়) এটি এমন কোন কারিগর বা ডিজাইনারের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে না যাঁর অস্তিত্ব বিষয়ে আমাদের হাতে অপর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে।

বিবর্তন তত্ত্ব অনেক বলিষ্ঠভাবে প্রজাতির উৎপত্তিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। সময়ের সাথে সাথে প্রজাতির পরিবর্তনকে ডিজাইন বা পরিকল্পনার চেয়ে বরং আকস্মিক মিউটেশন, প্রভেদমূলক প্রজনন, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং

অভিজোজনের সাহায্যে অনেক ভালভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তারচেয়েও বড় কথা হল, দেহের বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় অংগাদি যেমন, অ্যাপেন্ডিক্স, মেরুদন্ডের নীচে রয়ে যাওয়া লেজের হাড়, কিংবা পুরুষের স্তনবৃন্ত -এগুলোর অস্তিত্ব কোন নিখুঁত পরিকল্পনা বা ডিজাইন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের আরেক ধরনের ভাষ্য হচ্ছে তথাকথিত সূক্ষ-সমন্বয়ের যুক্তি (Fine tuning argument)। এর প্রবক্তারা মনে করেন, প্রকৃতির ভৌত চলকগুলোর সূক্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে এমনভাবে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড তৈরি করা হয়েছে যে এখানে জীবনোপযোগী পরিবেশ গঠন সম্ভব হয়েছে। এবং তারা মনে করেন এর পেছনে পরিকল্পনাকারী হিসেবে প্রচ্ছন্ন আছেন ঈশ্বর। কিন্তু এ যুক্তিও খুব শক্তিশালী বা পর্যাপ্ত কিছু নয়। প্রথমতঃ ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায় লক্ষ লক্ষ প্রজাতি টিকে থাকার সংগ্রামে হেরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কাজেই প্রকৃতির তথাকথিত 'সূক্ষ-সমন্বয়' তাদের জন্য কোন কাজেই আসেনি। দ্বিতীয়তঃ অসংখ্য মানুষও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণের বলি হয়ে যেমন বিভিন্ন রোগে কিংবা দুর্যোগে মারা গিয়েছে। ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরের তলদেশে ভূসঞ্চরণের কারণে ধেয়ে আসা সুনামীতে লক্ষ লক্ষ নিষ্পাপ পরুষ, মহিলা আর শিশু মানুষ মারা গেছে। এ উদাহরণগুলো খুব কমই প্রকৃতির সূক্ষসমন্বয়ের দিকে ইংগিত করে, বরং নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোন সূক্ষ-সমন্বয়ক এ ভুলভ্রান্তিগুলো দূর করায় সচেষ্ট হলে এই ব্যাপক প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব ছিল।

একই সাথে বলা যায়, সবচেয়ে বড় সমস্যাটি ত রয়েই গেছে - অশুভের সমস্যা (Problem of Evil)। যদি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং পরমকরুনাময় ঈশ্বর এই মহাবিশ্ব বিনির্মাণ করে থাকেন, তবে অশুভের (evil) উপস্থিতি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? স্বভাবতঃই ভয়াবহ বন্যা কিংবা প্লেগে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর জন্য কোনভাবেই মানুষকে দায়ী করা চলেনা। এটাকে একভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় - যদি ঈশ্বর নিজেই এক অপকারী বা ক্ষতিকর সত্তা হয়ে থাকেন। কারণ 'সর্বজ্ঞ' ঈশ্বরের জানার কথা যে এ ধরণের ভয়াবহ বিপর্যয় তার প্রিয় সৃষ্টিকে আঘাত হানতে যাচ্ছে, কিন্তু তা ঠেকানোর কোন ব্যবস্থা নেননি। কিংবা হয়ত নিতে পারেন নি, সেক্ষেত্রে তিনি এক অসহায় নপুংসক ঈশ্বর বৈ কিছু নন। এটাও প্রকারন্তরে প্রমাণ করে যে স্রষ্টা নির্বোধ (unintelligent) এবং ত্রুটিপূর্ণ (faulty) পরিকল্পক।

ধর্মবাদীদের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, ঈশ্বর কখনো সখনো কিছু মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে (দেখা দিয়ে কিংবা ওহি পাঠিয়ে) ধন্য করেছেন।

কিন্তু এই প্রকাশ কখনই নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের সামনে বস্তুনিষ্ঠভাবে আসেনি। ঈশ্বরের দক্ষিনা বিলানো হয়েছে গোপনে গোপনে, কিছু 'নির্বাচিত' পয়গম্বরের মাঝে, যাদের দাবী সংশয়মুক্তভাবে যাঁচাই করা যায়নি। ধর্মগ্রন্থগুলো ঘাটলে ঈশ্বরের নানা রকমের অলৌকিক কীর্তি কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়, যেগুলো আসলে সংশয়ের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বরং তথাকথিত অলৌকিক কাহিনীর পেছনের প্রাকৃতিক কারণকে খুঁজে পেতে আমাদের সাহায্য করে।

বাইবেল, কোরান প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলো অজস্র ভুলে ভর্তি, পরস্পরবিরোধী কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। ওই গ্রন্থগুলি আসলে প্রাচীণকালের মানুষদের হাতে রচিত, যা সে সময়কার চিন্তাভাবনাকে তুলে ধরেছে। সেগুলো ত ঈশ্বরের বানী নয়ই বরং বিভিন্ন জাতি আর গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্প আর লোকগাঁথাগুলোর সংকলন বলা যেতে পারে; কাজেই সে বাণীগুলো কখনোই সকল কালের জন্য, সকল সমাজের জন্য কিংবা সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্ট ইতিহাসকেও সঠিকভাবে বর্ণনা করেনি। মোসেস, আব্রাহাম বা জোসেফের অনেককিছুই ইতিহাসনির্ভর নয়। নিউটেস্টামেন্টের রচয়িতাদের মধ্যে কেউই যে যীশুকে স্বচক্ষে দেখেনি তা গবেষণায় ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। চারটি গসপেল চাক্ষুষ সাক্ষীর ভিত্তিতে রচিত হয়নি, বরং নানা লোককথা এবং জনশ্রুতির ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। যীশুর কুমারী মাতার গর্ভে আলৌকিক জন্ম, তাঁর আলৌকিক চিকিৎসায় রোগ সারানো এবং মৃত্যুর পর তার পুনরুত্থান নিয়েও তর্ক বিতর্ক এবং পরস্পরবিরোধিতার শেষ নেই। ঠিক একই ভাবে মুসলিমরা যেরকম দাবী করেন, আল্লাহর ওহী একেবারে অপরিবর্তিতভাবে মানুষের কাছে এসে পৌঁছিয়েছে, সেটিও ঠিক নয়। ইতিহাস ঘাটলে কোরানের অনেকগুলো ভাষ্য পাওয়া যায়, কাজেই এটাও বাইবেলের মত নানা বৈচিত্রময় লোককথার সংকলন বৈ কিছু নয়। তেমনিভাবে, যে হাদিসগুলো মুহম্মদের বানী হিসেবে তার সাহাবাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবী করা হয়, সেগুলোও ইতিহাসভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়নি।

কেউ কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কারণ তারা মনে করেন ঈশ্বর তাদের ব্যক্তি জীবনে হস্তক্ষেপ করেছেন, এর ফলে তারা জীবনের এক নতুন উপলব্ধি খুঁজে পেয়েছে। এগুলো ব্যক্তিবিশেষের মনোজগতের আত্মগত অভিজ্ঞতা, কোনভাবেই কোন আপার্থিব সত্তার অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। ঈশ্বর দর্শন, গায়েবী আওয়াজ শোনা ইত্যকার ব্যক্তিবিশেষের মনোবৈকল্যকে মনোবিজ্ঞানের

সাহায্যেই খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা কর যায়, কোন স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের কাছে নতজানু না হয়েই।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর কি একজন ব্যক্তি? তাঁর কি মানব সদৃশ আকার আছে? তিনি কি মোসেস, আব্রাহাম, যীশু, মুহম্মদ কিংবা অন্যান্য পয়গম্বরদের কাছে কোন উপলব্ধিযোগ্য কোন রূপ ধারণ করে যোগাযোগ করেছিলেন?

আবারো বলতে হয়, এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ সাক্ষীর অভাব রয়েছে। বরং রটনাবিদদের নিরন্তর রটনা আর বিশ্বাসনির্ভর প্রচারণাকেই প্রশ্নাতীতভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন পুঁথিপত্র এবং গ্রন্থগুলোতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে 'প্রমাণ' পাওয়া যায় সেগুলো সবগুলোই ভ্রান্তিময়, সাহিত্যবোধহীন, প্রাগৈতিহাসিক (কু)দর্শনের প্রভাবযুক্ত এবং সর্বোপরি নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবার যোগ্য নয়। ঐগুলোর অনেকগুলিই প্রাচীন কবিদের দৈব বন্দনা দিয়ে যত না প্রভাবিত, কিন্তু ততটাই প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে অন্তঃসারশুন্য, আর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক গবেষণায় অনুত্তীর্ণ। শুধু তাই নয়, এদের অনেকগুলোই আবার বৈধতা আর প্রামানিকতার দাবীর সাপেক্ষে পরস্পরবিরোধী।

প্রাচীন বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি-সদৃশ ঈশ্বরের সপক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। এই নরত্বরূপী ঈশ্বর আসলে প্রাচীন মানুষের উর্বর মস্তিস্কের চিন্তাভাবনার ফসল, সে জন্যই ঈশ্বর মানব আশা-আকাঙ্খার সাথে সংগতি রেখে রূপ নিয়েছেন ব্যক্তি-ঈশ্বরে। সে জন্যই গ্রীক যোদ্ধা এবং লেখক জেনোফোন (Xenophon) বলেন, 'সিংহদের যদি কোন ঈশ্বর থাকত, তবে তা হত সিংহের বৈশিষ্ট্যসপম্পন্ন'। মানব ঈশ্বর তাই হয়েছে মানব সদৃশ - আর তা মানুষের আশা আকাংখা আর কল্পনাকে বাস্তবতা দিতে গিয়েই।

তৃতীয়তঃ, মানবিক নৈতিকতাগুলো সব ঈশ্বরপ্রদত্ত- এই ধারণা কিন্তু খুবই সন্দেহজনক। ওই তথাকথিত 'পবিত্র' বাণীগুলো 'নাজিল' হওয়ার সময়কার তদানিন্তন সমাজ-সাংস্কৃতিক অবস্থাকেই কেবল তুলে ধরছে, এর বেশি কিছু নয়। যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টে ব্যভিচারী, ধর্মবিরোধী, অবাধ্য, জারজ, ডাইনী এবং সমকামীদের শায়েস্তা করার জন্য পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান আছে। এটি সম্মিলিত অপরাধের উপর হুমকি দেয় : আছে জেহোভার তরফ থেকে তার সন্তানের অবিশ্বাসী সন্তানদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা। এতে পিতৃতন্ত্রের সাফাই গাওয়া হয়েছে, এবং নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব স্থাপন করা হয়েছে।

দাসত্বকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এমনকি গণহত্যাকেও ঈশ্বরের নামে জায়েজ করা হয়েছে। নিউ টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, 'সিজারের জন্য সবকিছু দিয়ে দাও, কারণ সবকিছুই সিজারের জন্য'; এটি দাবী করে স্ত্রী তার স্বামীর কর্তৃত্বাধীন থাকবে। এটি ফেইথ হিলিং, ঝার ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র এবং অলৌকিকত্বকে গ্রহণযোগ্যতা দেয়। এতে 'স্বাধীনতা'র চাইতে বরং 'বাধ্যতা'র জয়গান গাওয়া হয়েছে, 'সাহসিকতা'র চেয়ে সাফাই গাওয়া হয়েছে 'কাপুরুষতা'র, 'আত্মনিয়ন্ত্রণ'-এর বদলে বরং প্রশংসা করা হয়েছে 'ভীরুতা'র। কোরান কোন ভিন্নমতকে প্রশ্রয় দেয় না, চিন্তার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, খর্ব করে অবিশ্বাসী হবার প্রয়াসকে। এটি মুহম্মদের উপর 'নাজিল' হওয়া গ্রন্থটির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পন দাবী করে। এটি রাষ্ট্র এবং ধর্ম পৃথকীকরণ প্রচেষ্টাকে বাতিল করে দিয়ে বরং মোল্লা এবং ইমামদের শারিয়া আইন প্রবর্তনে ইন্ধন যোগায়।

ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে নানাপদের বিপরীতমুখি এবং পরস্পরবিরোধী খেলা খেলতে ভক্তবান্দাদের জুড়ি নেই। তারা কখনো ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, কখনো আবার যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে; কখনো দাসত্বের পক্ষে দাঁড়িয়েছে, কখনো বা বিরুদ্ধে, কখনো মৃত্যুদন্ডের পক্ষে কথা বলেছে, কখনো বা এর বিরুদ্ধে, কেউ রক্ষণশীলতার সাফাই গান ত কেউ গান সংস্কারের। কখনো রাজার স্বর্গীয় অধিকারের উপর, দাসত্বের উপর, কখনো বা পিতৃতন্ত্রের উপর আস্থা রেখেছে তো কখনো করেছে এগুলোর বিরোধিতা, কখনো নারীমুক্তির পক্ষে থেকেছে ত কখনো দাঁড়িয়েছে এর বিরুদ্ধে। কখনো জন্মনিয়ন্ত্রণ, ইচ্ছামৃত্যু, গর্ভপাতের অধিকারকে সমর্থন দিয়েছে তো কখনো দেখিয়েছে বৈরিতা, কখনো যৌন এবং লৈংগিক সাম্যের প্রতি আস্থাশীল থেকেছে ত কখনো পোষণ করেছে অনাস্থা।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় সত্যিকারের ধর্মানুরাগীরা খুব কমই ব্যক্তিস্বাধীনতা কিংবা স্বাধীকারের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। তারা মানবতাকে পায়ে দলে বরং ঈশ্বরের বানীকেই শিরোধার্য করেছে, যুক্তি ত্যাগ করে বরণ করেছে বিশ্বাসকে, সংশয়ের পথ ছেড়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছে অন্ধত্বের পদতলে। বহু সময়ই মানবীয় বুদ্ধি ও শক্তির উপর আস্থা না রেখে মত্ত থেকেছে অদৃশ্য ঈশ্বরের কাছে অর্থহীন স্তব-স্তুতি আর নিস্ফল প্রার্থনায়। কিন্তু সেগুলোতে কাজ কিছু হয়েছে?

'কাতর সে আহ্বান লুটি গ্রহে গ্রহে
ফিরিয়া কি আসে নাই, ধরায় আগ্রহে?'

সংশয়ীরা তাই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 'কোন আরাধ্য দেবতা নয়, মানুষ

নিজেই নিজের ভাগ্য-বিধাতা'। সনাতন ধর্মগুলো শুধু অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপরই শুধু আগ্রাসণ চালায়নি, সেই সাথে লড়াই বাধিয়ে রেখেছে নিজ ধর্মেরই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে (ক্যাথলিক বনাম প্রোটেস্ট্যান্ট, শিয়া বনাম সুন্নী ইত্যাদি)। ধর্ম নাকি পৃথিবীতে এসেছে কল্যাণের জন্য, কিন্তু মারামারি, হত্যা, রক্তপাত, নিষ্ঠুরতা আর অব্যক্ত বিভীষিকা দিয়ে পবিত্র মতবাদগুলোকে জায়েজ না করলে তার যেন শান্তি হয় না। একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী ব্যক্তি (True believer) সবসময়ই মানব উন্নয়নের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাধ সেধেছে দাসত্ব বিমোচনে, নারী মুক্তিতে, বৃহন্নলা এবং সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কিংবা গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষায়।

আজকের যুগের কিছু উদার ধার্মিকেরা (liberal religionists) মৌলবাদকে পরিত্যাগ করেছে মানছি, কিন্তু তার পেছনে ক্রমিক অবদান রয়েছে আধুনিক গণতন্ত্র এবং মানবিক গুণাবলীর, যা তাদের আগ্রাসণকে দমিয়ে কিছুটা হলেও পরমতসহিষ্ণু করে তুলেছে। তারপরও পুরোপুরি মানুষ করতে পারেনি। কারণ ধর্মবাদীরা শেষ পর্যন্ত মোক্ষ খুঁজে পায় পার্থিব সমাজ ছেড়ে ওই ইসলাম, জুডাইজম কিংবা খ্রিষ্টান ধর্মের কানাগলিতেই।

চতুর্থত, আমাদের বলতে বাধ্য করা হয় যে, ঈশ্বরে যারা বিশ্বাস করেন তারা কি দাবী অনুযায়ী (আত্মার) অমরত্ব এবং নির্বান লাভ করবেন?

প্রথম আপত্তিটি হল, এই অমরত্ব বা নির্বানপ্রাপ্তির ব্যাপারটা পুরোপুরি গোষ্ঠিকেন্দ্রিক। হিব্রু বাইবেল অমরত্ব বা নির্বানের ব্যাপারে গুটিকয় নির্বাচিত ব্যক্তিকেই শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়। নিউ টেস্টামেন্ট শুধু তাদেরই পুরস্কৃত করে যাদের যীশু খ্রিষ্টের উপর আস্থা আছে। কোরানের দৃষ্টিতে বেহেস্ত নসিব হয় শুধু তাদেরই যারা আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত নবী মুহম্মদের উপর বিশ্বাস করে।

সাধারণভাবে এই প্রতিশ্রুতিগুলো সার্বজনীন নয়, বরং ধর্মযাজক, পুরুত আর মোল্লাদের দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত বিশেষ পথে চললেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটবে বলে জোর গলায় প্রচার চালান হয়। ধর্মীয় আইনকে বৈধতা দিতে ধর্মযুদ্ধের নামে কত যে রক্তপাত ঘটেছে তার ত ইয়ত্বা নেই। মারামারি হয়েছে প্রোটেস্টেন্টদের মধ্যে, রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে এবং প্রাচ্যের বিশ্বাসগুলোর মধ্যেও। রক্তপাত ঘটেছে মুহম্মদ এবং কোরানের আইন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, কিংবা ওল্ড টেস্টামেন্টকে উর্ধ্বে তুলতে গিয়ে।

দ্বিতীয় আপত্তিটি হল, আত্মার অমরত্বের কথা বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু আত্মার অস্তিত্বটাই তো বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত নয়। তার চেয়েও অসার হচ্ছে মৃত্যুর পর সেই আত্মা দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিচরণ করার ব্যাপারটি। বিজ্ঞান আমাদের বলছে 'মন' কিংবা 'সজ্ঞা' ব্যাপারটি মস্তিস্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের কাজকর্মের সম্মিলিত অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। মৃত্যুর সাথে সাথে দেহের মৃত্যু ঘটে, বিনাশ ঘটে ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের। কাজেই, কোন লোকের আত্মা চিরদিন কিংবা স্বর্গে গিয়ে বেঁচে থাকবে - এগুলো কোন বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে সমর্থিত নয়, শুধু কতকগুলো অন্ধ আবেগি বিশ্বাসই সার।

একইভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, বিশ্বাসীরা এখন পর্যন্ত আমাদের আগে বিগত হওয়া কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কারো আত্মাকে মর্তে ডেকে এনে এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিতে পারেন নি। তথাকথিত আত্মার সাথে যে কোন ধরনের যোগাযোগের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। জ্বিন-ভুত দেখার ব্যাপারগুলোও কোন নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী দ্বারা সমর্থিত নয়।

মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলো (near death experience) কেবল রিপোর্ট করেছে সে সমস্ত ঘটনাগুলোরই যেগুলোতে কেউ মৃত্যু প্রক্রিয়াটির কয়েকটি ধাপের মধ্য দিয়ে গেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর মারা যায়নি। বলা বাহুল্য, আমরা এমন কোন কেস পাইনি যেখানে কোন ব্যক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাপকাঠি অনুযায়ী সত্য সত্যই মারা গেছেন, চলে গেছেন এ পার্থিব জগৎ ছেড়ে, তারপর আবার ফিরে এসেছেন আমাদের কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে। সে হিসেবে মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোকে ব্যক্তি বিশেষের আত্মগত (subjective) কিছু অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে এগুলোকে প্রাকৃতিক, মনস্তাত্বিক এবং শরীরবৃত্তিয় কারণের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায়।

পঞ্চমতঃ, আস্তিকরা বলে বেড়ান যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ছাড়া কেউ ভাল হতে পারে না।

ঈশ্বর এবং প্রত্যাদেশে সংশয়ী হওয়া মানে নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক কিছু নয়, নয় মুল্যবোধের অবক্ষয়। হাজারো উদাহরণ হাজির করে অসংখ্যবারই দেখানো হয়েছে যে, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া এবং সৎভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব কোন ধর্ম না মেনেই। একজন ব্যক্তি নৈতিকগুণাবলীর চর্চা করতে পারে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা ছাড়াই। কাজেই কোন অপার্থিব সত্তায় বিশ্বাস ছাড়াই কেউ সৎ, পরপোকারি, সহানুভূতিশীল কিংবা

মহৎ হওয়া কোন 'সোনার পাথর বাটি' নয়। পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার পাশাপাশি নিজস্ব উন্নয়নের জন্য চিন্তা করাও এক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক। ইহজাগতিকতা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ গুণাবলির চর্চা সে হিসেবে যুক্তি এবং সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, দেখতে হবে যেন নৈতিকতার বিকাশ সাধারণ মানুষদের একটি সাধারণসূত্রে গ্রন্থিত করে। আমাদের নীতি এবং মুল্যবোধ আমাদের পার্থিব অভিজ্ঞতার কষ্ঠিপাথরে ঝালিয়ে নিতে হবে বারে বারে। মানবতাবাদী হিসেবে পরিচিত সংশয়বাদীরা সব সময়ই ভালভাবে এ পার্থিব জীবন উপভোগ করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। তারা জীবনকে দেখে নান্দনিক সৃষ্টিশীলতার এক অনুপম ক্ষেত্র হিসেবে, অন্তহীনভাবে খোঁজ করে যায় সুখ এবং সমৃদ্ধির, আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে তুলে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে। তারা জীবনের শোক দুঃখ কষ্টকে স্বাভাবিক ব্যাপার মেনে নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণের আহ্বান জানায়, দাবী করে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলার। জীবন অনিন্দ্যসুন্দর করে তুলতে আমাদের নিজেদেরকেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে, কোন বহিস্তঃ সত্তার কাছে স্বীয় বিবেক বিকিয়ে না দিয়ে।

যদিও নীতি এবং মূল্যবোধের ব্যাপারগুলো অনেকাংশেই হয়ত সামাজিক চাহিদার নিরিখে আপেক্ষিক হিসেবে গন্য হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেগুলো একেবারেই আত্মগত। বরং অনেকক্ষেত্রেই তা বস্তুগত (objective),এবং ক্রমিক সংঘর্ষ এবং সমালোচনার নিরিখে পরিবর্তনশীল। সংশয়বাদ এবং মানবতাবাদকে সংযুক্ত করে এ এক নতুন যুগের সূচনা যা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক ভাবে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। কাজেই ধর্মের ব্যাপারে সংশয়ী ব্যক্তি মানবিকতা বোধে উদ্বেলিত হয়েই নৈতিকতার চর্চা করেন এবং জীবন সাজাতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেন। সে রকম একজন ব্যক্তি কেবল নিজের কথাই ভাবেন না বরং অন্যদের চাহিদাকেও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন।

এ প্রবন্ধের সারমর্ম করলে বলতে হয়, একজন মুক্তঅন্বেষক ঈশ্বরে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাননি বলেই তিনি সংশয়ী। তার সংশয় রয়েছে ব্যক্তি-ঈশ্বরের অস্তিত্বে, সংশয় রয়েছে প্রত্যাদেশে, সংশয় রয়েছে নৈতিকতার চর্চাকে ঢালাওভাবে ঐশ্বরিক মোড়কে পুরতে, সংশয় রয়েছে ঈশ্বরের দেখানো পথে আত্মার নির্বানে, কিংবা ভালমানুষ হতে গেলে ঈশ্বরে বিশ্বাসকে বাধ্যতামূলক হিসেবে দেখতে। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ভিত্তিক সংশয়বাদ মহাবিশ্বকে প্রাকৃতিকভাবেই ব্যাখ্যা করার এক উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি করে। শুধু তাই নয়, নৈতিকতার চর্চায় এটি ইহজাগতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান যোগ করে। যখন এধরনের মুক্তান্বেষককে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা জানতে চেয়ে,

তিনি উত্তর দেন- ‘না, আমি করি না, আমি এ ব্যাপারে সংশয়ী’, আর সে সাথে এও বলে দেন, ‘আমি বিশ্বাসী মানুষের জন্য ভাল কিছু করায়’।

---

*আন্তর্জাতিক অংগনে সমাদৃত বিরাশি বছর বয়স্ক সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট দার্শনিক ও লেখক পল কার্জ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক, বাফেলো-র দর্শনের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং *ফ্রি ইঙ্কয়ারি ( Free Inquiry)* ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনেক গুলো বিজ্ঞান ও মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠানের একটি হচ্ছে *সেন্টার ফর ইঙ্কয়ারি ট্র্যান্সন্যাশনাল।* ওয়েবসাইটঃ www.secularhumanism.org

উপরের অনুবাদ টি লেখকের সম্পূর্ণ অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশিত হল। এই অনুবাদ টি সম্পূর্ণ বা আংশিক আকারে কেবলমাত্র শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উদ্দেশ্যে পুনর্মুদ্রিত করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে মূল উৎস অর্থাৎ www.mukto-mona.com উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। ধন্যবাদ।